উপন্যাস

ভুল সত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে 2

২. পুন্নিকে দেখতে এলেন 31

৩. ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশি 57

৪. লোকটা ধরা পড়ল 86

১. দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে

ভুল সত্য – উপন্যাস – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দু’খানা ভোলা। দু’ পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তার বাঁ হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর একটা দামি ট্রানজিস্টার রেডিয়ো। রেডিয়োর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজি চুরুটের বাক্স, দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিকরে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিয়োতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয়পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নীচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে–এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা…।

সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুব দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ, মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দু’দিন পর। সরোজিনী একটু পাগলি আছে। রামপ্রসাদি সুরে সারা দিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তার। মাঝরাতে এক বার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগি ঘর। বারান্দা থেকে অনেক দূর দেখা যায়। খুব বেশি গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাদ-ফাদ দেখলে কুকুর-বিড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বিয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বিয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন, তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বিয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে এই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয়নি যে গোল হবে।

কাঠের সিড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারও এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্ত বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে, ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে, ও কাকা।

দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন, হু।

ঘুমোচ্ছ?

শরীরটা ভাল নেই। কেন?

সোপাস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেন্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

কত?

পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন, খামোখা।

এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাব?

গেলেই ভাল। নইলে আরও টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

হিসেব তো এখনও শেষ করিনি। খরচ তো এখনও হচ্ছে। তবে হাজার ত্রিশেক বেরিয়ে গেছে।

আরও যাবে।

লস হবে বলছ?

হবে।

কেন?

ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

করিয়েছি।

কী বলে সার্ভেয়াররা?

কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নীচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

হু।–দিগিন বলেন।

কী করব?

যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনও অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

কিন্তু কলকাতায় যেনমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খদ্দের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাব।

দিগিন চোখ খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন, যা ভাল বোঝো করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে, তুমি একদম অ্যাডভাইস দিচ্ছ না। গত দু' বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তা হলে আমার। মনের তাবস্থাটা কী হয় এক বার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে।

সোপস্টোন তো আর হিরে-জহরত নয়। ওর পিছনে দু'বছর অত টাকা ঢালা বোকামি হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে, কিন্তু ভুটান গভর্নমেন্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও ততা ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন, তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যাবসা করবে।

কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাওনি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি লাভ চাইছি না। খরচটাও যদি উঠে আসত।

উঠবে না। বরং আরও টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত।

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল, কাছেপিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনও খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরও তিন জন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-

খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশিই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

ছোটকাকা।

হু।

অনেক লস হয়ে গেল।

বুঝতে তো পারছি।

বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে?

কী করব?

কিছু একটা করা তো দরকার।

দু'বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ, এ তো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডঙ্কাও হয়, তবু ওই চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে, তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

যাচ্ছি না। গেছি। –বলে আর-একটা সরু মাদ্রাজি চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তার তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাত

হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে তিনি স্ফুর্তিযুক্ত হয়ে বলেন, যা গেছে। ছেড়ে দাও। ওইটাই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেয়ো না।

ভুলিনি বলেই তো বলছি। আরও যা লস হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সে যেতে-না-যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

ছোটমামা।

হু।

চা।

হু।

ঠক করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে, কারা যেন আসছে আজকে আবার।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন, কারা?

কী জানি!– পুন্নি ঠোঁট উলটে বলে, শুনছি কারা যেন আসবে।

কত কে আসে।–দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন, কার কথা বলছিস?

তুমি বুঝি জানো না? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

ও– বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন-গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠান্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনও শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

তা কী করবে?– পুন্নি জিজ্ঞেস করে।

কী করব? এলে আসবে।

আমি সামনে যাব না।

সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন? চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

আমি সামনেই যাব না।

কেন?

আমার ভাল লাগে না।

ও।–বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিয়োটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিয়ো বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতার ও পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

ছোটমামা।

হু।

আমি যা বলেছি শুনেছ তো?

শুনলাম।

আমি সামনে যাব না।

আচ্ছা।

আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

দিগিন ‘হু’ দেন।

ঠিক তো?– পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।

হু।

কী করবে?

তোর বদলে দকলীকে দেখিয়ে দেব।

টের পাবে না?

টের পাবে কেন? এত বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দলীও তো আমাদের ভাগনিই। তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে, আহা।

দিগিন বলেন, কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে, দকলী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি? তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন এক বার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সে বার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার এক দিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেননা, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের এক ধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজটাকে এক বার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তার দিকে গড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাখানেক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম তৈরি করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তার কোনও ধারণা ছিল না দিগিনের। পরের দিন বন্ধুরা এসে পৌছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ওই তরমুজের ধারেকাছেও তারা ঘেঁষেনি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বিয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিঙের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমও, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারির কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যাবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগি ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তার হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে

টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তার অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তার নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোক কিছুই বাদ রাখেননি। এখনও তার নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধাধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বউ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকিত্বটা চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগি ঘরটার আশেপাশে আরও দু'খানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাদের ভাঙেনি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজোজনের ওষুধের স্টেশনারি, বড় ভগ্নিপতি কয়লার ব্যাবসা করে, ছোট ভগ্নিপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

.

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটর-সাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন, কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগন থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামি একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ঘঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা। জুলপি চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দু খিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

আরে দিগিনদাদা।

যাচ্ছিস কোথায়?

কাল রাতে জোর ধস নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজি তো খার্সাঙে আটকা পড়ে আছে। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এ পারে আসতে পারে তো নিয়ে আসব।

দিগিন বলল, ধস? কই আমি তো শুনিনি।

শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। একসময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নি করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন, বের হয়ে হবে কী? কাজকারবার কিছু নেই।

কাজ নেই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরিবের বাড়িতে। ডিসকাস করা যাবে।

দিগিন লক্ষ করেন, কাঞ্চনের জুলপির চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন, আসবখন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে, শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেন্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে। শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন, বেশ আছিস কাঞ্চন।

হ্যাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

ও কথা সবাই বলে।

জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা। বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়েনি। তার চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তরবাংলার সবচেয়ে বড় ব্যাবসাকেন্দ্র হয়ে উঠা, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারির ব্যাবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যাবসাতে নেই, ওকালতি করে তার একরকম চলে যায়। মেজোজন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দুজন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারিতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু টাকা আছে, চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন, শানুটাকে ব্যাবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে, শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন, ততার সঙ্গে একদিন বসব।

আচ্ছা।

কাঞ্চন তার তোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায় বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ওইরকমই বয়স। ভটচায় বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানিতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষয় গলায় বলেন, এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ করলেন। কিন্তু বেশি কথার মধ্যে গেলেন না। তিন জন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায় বললেন, এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

হু।

আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটা খান। চুরুট খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজি চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফসফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচার্য বলেন, নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনও ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট থাকেন মশাই?

ফিট থাকি নেশা করি বলেই।

সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনও রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায় একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন, সত্যি?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন, কোনও মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনও? জেনুইন মাতালের ও সব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

দুর।

মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনও জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায় চিন্তিত মুখে বলেন, তা বটে।

তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কি না।

আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনি নেশা।

না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে, অ্যালকোহল আরও ভাল। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াব। দেশি জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেব। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায়। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন, আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করবেন না তো?

গিনিপিগ। বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন, আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপ্মমনে হাত দু'খানা টিপেটুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশি বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায়নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাটা-চলা-পরিশ্রম কোনও যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায এবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন, শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাং ধরাবেন না তো মশাই।

দিগিন ভটচাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন, জীবনের একটা দিক একেবারে না-জানা থাকা কি ভাল? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপরে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কী কী রকম সব অভিজ্ঞতা হল, তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন, বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেন্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা জোগাবে কে?

ভূতে, নেশা লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

না মশাই, আমার ও-সব দরকার নেই।

আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, এক দিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত এক দিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেব। ওই সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

আচ্ছা যাব!–ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন। আজকাল আর তার অ্যাকাউন্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতি মাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে। তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কী কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহভাগ তাকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন, সাইটটা দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রিজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাক গে, ঠিকাদারিটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তার মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তার চেনা। বাইক থামিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোল না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নিচু মাঠ আর

বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিয়ো স্টেশন পেরিয়ে খানিক দূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বা ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক-আধটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারির লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারা দিনই থাকে।

আধমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পৌঁছে যান তিনি। অনেককাল আসা হয়নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়িঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রির তৈরি দু-চারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারি, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্পবয়সি বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এ রকম একটু সংলাপ ভেসে আসে

মহিলাকণ্ঠ-সে কেমন দেখতে?

বাকসিদ্ধাই-রোগা, ফরসা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ-আমার ছেলের সঙ্গে মানায়?

বাকসিদ্ধাই–মানায়।

জাত?

স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ সনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে?

হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতকগুলো বাচ্চা ছেলে খেলছে। উত্তর প্রান্তে খেত। উদাস মাঠ, তার ও পাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজি চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালি কাঠখোট্টা এক মিলিটারি সওয়াল-জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন! সিদ্ধাই তাকে চেনে। এক বার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে, ভাল তো?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন, না।

কী হয়েছে?

আমার ভাইপো

বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এ সব প্রশ্নের কোনও মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তার।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন, মা, আমার মরণ কবে?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে, সে দেরি আছে।

কত দেরি?

অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

ডাঙর মেয়েছেলে? সে কে?

ফরসা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ি মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না একসময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন, কীরকম ক্ষতি?

পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলে, সাবধানে থাকবেন, তবে আপনার এখনও অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচ টাকার নোেেট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে, আর কিছু জানবেন না?

না। আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

বুড়ো মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে, শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেব, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কী? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন, কী রে?

ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

চা, তার এত তাড়া কী?

বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে?

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে। বলেন, যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দকলীকে বলে রেখেছি, সে রাজিও হয়েছে।

পুন্নি বলে, ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে, রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

তোকে বসতে কেউ বলেছে?

না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে, চা-টা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারা দিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে। কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনও ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তার নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত, তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জ মতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যাবসা, চা বাগানের মালিকানা কোনও চেষ্টাই তার কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামির খেয়ালবশে এক বার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হিরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে। তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হিরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হিরে পাননি তা নয়। ছোট ছোট কম দামি কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনওক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জন্ডিস ধরল। মাস ছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ি রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তার নেশাভাং একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর এক দিন মনে হল, একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকিত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও, তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলেন হরেন বোসসে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন, বিয়ে না করে এক রকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি ললাটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই,

কিন্তু চল্লিশের পব ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ওই বয়স থেকে লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর না নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্যব্যাপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা-দুটো দিন কাটাতেন। চার ধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনও কোনও বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জ্বেলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস এক দিন তার শালির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বউ ছিল নেপালি। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালি ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকিত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজি ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে! করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বউয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারিতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরিতে পারিবারিক সবজির দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশি বয়স নয়, দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু’গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াশ, বাঁধাকপি, বিন, শুটি, ফুলকপি সাজাননা। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালি কয়েকজন গাদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তার রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নিচু নজরে দেখে, কু-প্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কচি আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজি হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সুর্যোদয় দেখতে। বহু বার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁপ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালি ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনও অসুবিধে হয়নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পালটে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ওই বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন, থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরেকেটে ষোলো, রাজি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের। শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল, যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলল, তা হলে থাকব।

থাকা মানে কী জানো তো?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনও পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনও রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তার সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তার স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশি কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন, তোমাকে কলকাতা দেখাব।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জিপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জিপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তার ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়েছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করেনি।

টংগি ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস, মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনও সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিন দিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

কী খবর ভায়া?

ভালই।

ময়না?

আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন, জানতাম।:-বলে একটু শাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালি পপাশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিথেয় সিদুর, এক

বেণিতে বাঁধা চুল, খুশিতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশি হলেন। বললেন, ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকাননি। বলেন, তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজি নই।

কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

ও সব ছাড়ুন! ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপণ হিসেবে।

ময়না এ রকম সম্পর্ক মানবে?

মানবে আবার কী? মেনে তো নিয়েছে।

না, মানেনি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করেনি। বয়স হলে বুঝবে।

ও এক রকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি!

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন, ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমি 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন, তা হলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন, হঠাৎ এ রকম ধারা করতে গেলে কেন?

দিগিন একটু ভেবে বলেন, আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনও ঠিক করিনি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাব। ভেবেছিলাম আমার বাউন্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নীচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁ দিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কত বার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ওই রকম ভোলা জায়গায়, ওই গভীর বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামি আর নেই। যার একটা শেকড় গজায় সে বাকি দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন, আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরিতে কামড় বসিয়ে বললেন, তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন, মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকেনি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু-চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনও দেননি। তখন প্রাচীনপন্থী মা বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায়নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু'বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে করা বউ বলে কখনও মনে করেননি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশি নিজস্ব জীবনযাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যাবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে, সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশি কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা বাপ তখনও বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশি বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু'-এক কথাতে সে রাজি হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তার কিছু মনে হল না। কোনও অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিড়ে ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশি ছিল

না। বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু-একটা স্বভাবদোষ মানতে কারও আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ঘোট একটা বাড়িতে উঠে গেছে। ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়ে গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোযায়নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিঙের ছোটছেলে অবতার সিঙের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে করা বউ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয়নি, বাঁজা ময়না এখনও নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছু দিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছু দিন আগে মারা গেছেন। তার বউ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু ময়না একা। বড় একা।

২. পুন্নিকে দেখতে এলেন

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিকশা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তার ফরসা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন, দেখেন, যেন ঠিক পাকনা শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন, সেই লৌকিকতা।

না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ, একটু মিষ্টিমুখ আর কী।

রক্তে চিনি একশো কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তা হলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেলে পুন্নির বাপা পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবুপুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে এক পলকের বেশি চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরি করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন, যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন, কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, রং তো কালোই, মুখশ্রী ওই চলনসই।

পুন্নির বাবা বলতে গেল, কিন্তু কাজকর্ম–

ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন, ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজকর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারি নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন, কী দেবেন আপনারা?

যা চান।–দিগিন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

চাওয়ার কী? আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

হুঁ।-বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন। বললেন, আলমারি তো গোদরেজের?

তা-ই হবে।

গয়না?

চোদ্দো-পনেরো ভরি।

ঘড়িটা?

রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন, আমি কী পাব?

মানে?

ছেলে আর ছেলের বউ তো এ সব পাবে। আমার পাওনা কী?

কী চান?

নগদ।

বলুন কত?

আমি বলব না। শুনব।

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাতজোড় কবে বলেন, আমি কিছু বলব না, আরও চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামশেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপার পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নিপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন, দিগিন। দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজি চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন, আমরা দুই হাজার নগদ দেব।

দুই!–ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে। তারপর হঠাৎ বললেন, দশ।

অ্যাঁ।–ভদ্রলোক তাকালেন।

দশ হাজার দেব। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নিপতি সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন, আচ্ছা।

আচ্ছা নয়, দশ হাজার দেব। বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ-গিনিপিগের মধ্যে কোন কথায় বা কোন অবস্থায় কী রকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফরসা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলে, আমার বড় আদরের ভাগনি। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ

কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তা হলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে। লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর-একটু লাল করে তুললেন। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটায় এক বার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন, আলমারিটা গোদরেজের তো?

নিশ্চয়ই।

সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন, পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেব। আর প্রত্যেকটি এক ভরি ওজনের ছ-গাছা চুড়ি।

আমার ছেলে কী পাবে? এ তো মেয়ের কথা হল, ভালই

একটা স্কুটার দেব, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানি কেন, মেয়ের কোনও গুপ্ত খুঁত আছে কি না এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন, আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

না, না, তার কী দরকার?

খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রু কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তার বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেননি। মেজদাও খুশি নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে, তা হলে পাকা কথা আজই হয়ে যাকা-বলে সমর্থনের জন্য চার দিকে তাকাল। তার দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন, সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন, মন্দ কী?

তা হলে? দিগেন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন, ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন, না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, মেয়েটিকে আর এক বার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখেমুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনছে, একথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করেনি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন, মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড় বউমা হবে তুমি, তা রান্নাটান্না কি বুড়োর একটু সেবা-টে, এ সব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়মমাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিন বার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে নিটি ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন, মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

কথা দিচ্ছেন তা হলে?

ভদ্রলোক একরকম হাপধরা হাসি হেসে বললেন, ওই দেওয়াই হল।

আমরা খুব বেশি দেরি করতে পারব না।

দেরি করে আমাদেরই বা লাভ কী?

তা হলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত দিন। কিন্তু সেগুলো সেকেন্ডারি ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানিসেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন, তা হলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁপ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁপ ছাড়লেন দিগিনও। ‘নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেই জন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবেন না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করেনি, জতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকিপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সারা রাত্রি ধরে একটা

ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে এক বার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশানে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা বাবা মেয়েকে শাসন করেননি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন, ও সব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে? বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশি দুর নয়! বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তার পর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ও সব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তার ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন, আমার ভাগনির সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

চেষ্টা করছি।

চেষ্টায় কী হবে? ধরা করার কেউ আছে?

না।

ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল, আজ্ঞে না। এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তাকর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে আসামের নেফায় তাকে বদলি করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায়নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশি হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন, ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

কেন ছোটমামা?

মিলিটারির সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায়, কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারও হাতে যদি পড়ে লজ্জার ব্যাপার।

পুনি লজ্জা পেয়ে বলে, আচ্ছা।

সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

যদি দিতে না চায়?

দেবে, বলিস না-দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছছাটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক-আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফলস প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শিগগির আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরি হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেননি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেননি।

কয়েক দিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পুন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়োচিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই। মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক। এবার নিশ্চিতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধ হয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগি ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠেছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের উপর পা তুলে দেন। পুন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তার একটু একা লাগবে। পুন্নিটা খুব সেবা করত।

পুন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পুন্নি উঠে এল নীচে থেকে।

ছোটমামা।

হু।

তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

কী?

অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

না হয় দিলাম।

ছি ছি, লোকে কী বলবে?

কী বলবে?

ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজোমামা, মেসোমশাই কেউ খুশি হয়নি।

কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

বলেছে।

কী?

কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশি হয়ে গেছে।

সে আমি বুঝব। তোর পাকামির দরকার কী? যা চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে, আমি এ বিয়ে করব না।

না করিস না করবি। আমি ঠিক দকলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেব।

তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বউদি এসে ডাকেন, দিগিন ভাই।

হু।

তাজ্জব। পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?

করলাম।

এত কিছুতে রাজি হলে কেন? কী এমন পাত্র?

পাত্র খারাপ না।

তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা, তুমি কী ভেবেছ বলো দেখি? ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন?

মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টু শব্দও করতে পারবে না।

কেন? আরও অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাত হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ করেছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখন তিনি তাকে

লোভানির পর লোভানিতে উসকে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠান্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ-গিনিপিগের বেশি কিছু নয়।

বউদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ঠাকরান, আজ ভাল করে শুটকি মাছ রাঁধো তো।

কেন, কেউ খাবে নাকি?

হু।

কে?

ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন, ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

বয়স হল, এখন ও সব ছাড়ো না!

ছেড়ে ধরবটা কী?

সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুটকি হলেই হবে নাকি?

না। ওই সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটে চচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বউদি চলে যাওয়ার আগে বলেন, টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘি ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাটছাট কোরো।

তাই কখনও হয়। কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাট হবে না।

তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস দিচ্ছে, ব্যাবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন, ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকেদারি তো আছেই। চিন্তা কী?

বউদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন, পুনির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাব না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বউদি শ্বাস ফেলে বলেন, তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ আমার এ সব কথায় থাকার কী?

মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বউদি বলেন, তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বউদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোব মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে-সব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধের মুখে দিগিন পোশাক পরে মোটর-সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায় এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাসে গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধাবে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউ মার্কেটে আলো ঝলসানো দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধার আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা সঁাড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব পাতা, সরপর, ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দু’খানা ঘর, বাগান, কুয়ো, সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রিল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালি ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে-মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকা-পয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুকতে শুকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পরদা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে, কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝেমধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকি আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকিতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামাননা।

চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধ হয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন, আও বেটা।

কখন এসেছেন?

বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

আমাদের ওখানে গেলেন না তো?

যাব। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনও দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোট হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড় বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিন্তু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালি ভাষায় কখনও কথা বলে না। এমনকী সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেয়ো।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন, বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

ও।–ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোনও মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তার পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিক-টিক ফেলেন না। বার দুই-তিন হেঁচকি তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন, কী খবর- টবর?

ভালই।

বন্নোরহো।

আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব?

দিনের বেলা।

আগেও তো দেখেছেন।

জরুর।

আমার মরণ কবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন, ওইসব জেনে কী হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

খোদায় মালুম।

ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন, কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোলো বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চলল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এ সব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরি বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন, রাখ। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন-চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে এক বার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শুন্যভাব। বহু বছর ধরেই কি ময়না তার শূন্য চোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করেনি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ি করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করেনি কখনও। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন? ময়না আজকাল কেবল এক রকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যত দূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনও বিশ্বাসের ভঙ্গ হয়নি। বউয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশি সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারির দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায় আসে। বরং উলটোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌনকাতরতার জন্যও

নয়। সে বোধ হয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারেনি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফরাকে খুঁজেছে। পায়নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি ময়না। সঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনও করেননি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারও বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পাননি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতরবাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইসল বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচবসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখখামুখি বসে।

ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

কত?

বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ।

আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে, মরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন?

এমনই।

আমি জিজ্ঞেস করেছি।

কী?

বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

ও।

ফকির সাহেব বললেন যে, বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছা করবে।

তাই নাকি।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এ সব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনও এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল, আমি কোথাও ঠিক চলে যাব।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে, শুনছ?

শুনেছি।

আমি কোথাও চলে যাব।

যেয়ো, আমি তো কখনও বারণ করিনি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে, কেন বারণ করোনি?

কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালি মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানা রকম পাপ-বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি।

প্রেশার কুকারের আর-একটা হুইসল বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নীচে বসে ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন, আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন, সিদ্ধাই বলল, একজন ফরসা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

মেয়েছেলেটা কে?

তা বলেনি।

ফরসা আর লম্বা?

হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সে কি আমি?

কী করে বলি?

কীরকম ক্ষতি?

তা-ও স্পষ্ট করে বলেনি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন, বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।

তুমি তো বিশ্বাস করো।

না, করি না।

তবে গিয়েছিলে কেন?

গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি তো আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

সেই জন্যই তো বলছি সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল, ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

শানু? চমকে ওঠেন দিগিন, কেন?

তেমন কোনও কারণ তো বলেনি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

কী বলল?

বলল, কাকিমা কিছু টাকা দাও, খুব লস যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন। বলেন, কাকিমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

টাকা দিলে?

দিইনি। বললাম দেব।

কত?

খুব বেশি নয়। দু'হাজার। তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

কেন?

ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন-গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন, ডোবাবে।

কী?

ওই ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ও রকম করে ডাকেনি কখনও। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনও আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট-বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন, টাকাটা ওকে দিয়ো না। কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন, তাতে ওর ক্ষতি হবে। যত দূর জানি ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

চাক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না-পারা ময়না ভিখারিনির মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন, ইচ্ছে হলে দিয়ো। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করছে। তা ছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দু'খানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে, আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তা হলে কী করতে?

শাসন করতাম।

বেশি জোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেব। তুমি কিছু বোললা না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন, সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলিনি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

তুমিও তো টাকা কম নষ্ট করো না।

সে করি রোজগার করে। ওর তো এ সব রোজগারের টাকা নয়। ব্যাবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেব।

সবাইকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছ, কাকে নিয়ে থাকবে?

আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে, শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন, কী বললে?

শানু বিয়ে করবে।

কাকে?

পছন্দ করা মেয়েকে।

তোমাকে কে বলল?

শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না।

ময়না নিজেই বলে, মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন। বললেন, ও।

আমি কী করব?

শানুকে বলে দিয়ে যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারি ব্যাবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশি করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে, আমি কি তোমার বউ?

দিগিন ভ্রু কুঁচকে চেয়ে বলেন, এ সব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন?

ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী। আমার মতো কাউকে বউ করে। এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো?

পারি।–দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

কেন পারো?

কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

৩. ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশি

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশি। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলির চাটটা টেনে নিয়ে বললেন, বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোট খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই?

দিগিন হেসে বললেন, এ হোট খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন, এ মশাই চলবে না। বড় লাউড জিনিস।

তা হলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা খিদে নষ্ট হবে।—বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশি মদ গলায় ঢালেন।

শুটকি মাছ আমি বড় ভালবাসি।

একটু মাল টেনে নিন, আরও ভাল লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরও দু'-এক চুমুক খান। বলেন, মাথা ঝিমঝিম করছে।

তা হলে আর-একটু চালান। ঝিমুনিটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন, এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচাযের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একেবারো বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

আর-একটু দিই?

দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন, খুব দামি জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

খান না মশাই, দামকে ভয় কী?

দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন ‘দামি জিনিস’ কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন, দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনও ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে?

একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোট করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি?

ভটচা হেঁচকি তুলে বলেন, শুটকি মাছ!

আসছে।

খুব ভাল জিনিস।

খুব।

বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয়?

হয়।

সবাই খায়?

না। আমি খাই আর বড়বউদি। আর কেউ না।

বউ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন, কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে।

দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন, কে থাকবে?

একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন, সে তো সবার থাকে।

সবার থাকে? ভটচায হেঁচকি তোলেন।

বিয়ে করলেই থাকে।

না না, বিয়ে করা বউয়ের কথা নয়।

তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।

ভটচার্য অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন, তা বটে। তা হলে আপনার একজন আছে?

একজন না, কয়েকজন।

কয়েকজন? ভটচাখ চোখ বড় করে তাকাল।

লোকে বলে না সে কথা?

না তো! একজনের কথাই শুনেছি।

লোকে কমিয়ে বলেছে।

রাখেন কী করে? একজনেরই যা খরচ।

রোজগার করি। রাখি!

বেশ খরচা পড়ে, না?

তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বউ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি?

ভটচায় মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলেন, বাড়িতে বসে এ সব খান, কেউ কিছু বলে না?

কী বলবে?

আপত্তি করে না?

বাড়িটা তো আমার।

তবু ফ্যামিলিতে কি এ সব চলে?

দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।

তা বটে।

ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।

কী করব?

ফুর্তি!

এই বুড়ো বয়সে?

ফুর্তির আবার বয়স কী? তা ছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশি সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশি খাচ্ছেন।

না, আর খাব না।

খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশি টানলে খাবার খেতে পারবেন না।

দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায় একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন, ওই! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হালকা লাগছে।

লাগবেই তো। দেশিটা খেলে আরও বেরিয়ে যেত।

হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন? এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে, বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে, তখন কী বলবেন? বলার কিছু আছে? ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করে নাকিসুরে তখন পেটের রোগ, বউয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট, এ সবই

বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে, যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখনি।

ভটচাযের চোখ দুখানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন, শুটকি মাছ?

হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-খলিত কণ্ঠে বলেন, বাড়িতে বড় ধরাকাটা! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেশনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায দু'চামচ ফ্রায়েড রাইস খেলেন, এক টুকরো মাংস, শুটকি মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাল, খেতে পারলেন না। তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন, বউ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?

নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিকশা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

কে?

আমি।

ছোটকাকা?

হা।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টা দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রতি দিনই সন্ধের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তার নেশা হয়নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে, কিছু বলবে?

হুঁ। বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদিপাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি-আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র্যাকে সাজানো। ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশি জামা কাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

শানু।

বলো।

ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল, তুমি চিরটাকাল কাকিমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

কাকিমা!

নয়?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শানু বলে, মানুষ যা-ই বলে বলুক, আমি জানি কাকিমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন, বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?

সম্পর্কটা সহজ করতে।

সেটা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?

শানু গম্ভীর হয়ে বলে, ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?

অন্যায়?

অন্যায় ছাড়া কী? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে মর্যাদা।

থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন?

চেয়েছি ধার হিসেবে।

কেন?

সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

সেটা আমাকে বলিসনি কেন?

বললে তো বকতে।

এখন কি বকব না?

শানু শ্বাস ফেলে বলল, সোপস্টোনের লসটা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশি লস হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশি হয়েছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা খেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের দু'খানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনও কথাই তাকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এ সব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তার কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তার চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন, আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনও আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদগুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দু' হাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনও শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতিস্বীকার করেছি, কিন্তু কোনও ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে, চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?

একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাব। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।

লেবাররা ছেড়ে দেবে না। ওদের অনেক টাকা বাকি পড়ে গেছে।

সেজন্য কে দায়ি?

আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। এখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন, বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল।

কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে, জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

হলে হব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ছোটকাকা।

বলো।

আর-একটু ভেবে দেখো।

ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

জানি। আমি বোকা নই।

তবু যেতে বলছ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন, শুনতেই তো পাচ্ছ।

ঠিক আছে।

যদি লেবাররা গোলমাল করতে চায় তা হলে কী করবে?

কিছু ঠিক করতে পারছি না।

ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হোয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেন্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনও ক্যানসেল করেনি, সুতরাং বাকিটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা।

মনে রেখো লেবার পেমেন্ট সবার আগে।

আচ্ছা।

আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?

অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

তবু ছেড়ে দাও।

এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?

কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেন্ট দর কমাবে না।

ভেবে দেখি!

দেখো! আর শোননা, যদি ময়নাকে তোমার কাকিমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িয়ো না।

শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন, বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করেনি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে এক বার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনও ঈশ্বর, কখনও শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে, তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে, আমি প্রতিবাদ করছি না।

আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন, বুঝে দেখো।

আমি খারাপ কিছু করছি না।

তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন, তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশত তোমার যে-কোনও ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

বলো, তাই ভেবেছিলে?

না।

তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন সাহসে?

আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

ঠিক আছে।– বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন, কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলল।

আমি কাকিমার কাছে ওকে রাখব না।

তা হলে কোথায় রাখবে?

অন্য কোথাও।

রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন, না।

শানু তাকায়। বলে, উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন, তুমি কাল যাচ্ছ কি না?

যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন, কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে, কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

কী জন্যে যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন, শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনও বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে চলে আসেন। একটু ঠান্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বিয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শাসি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত

জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তার নয়। তবু সবই তাকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুমচোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নীচে, বহু নীচে তিস্তা। তিস্তার দু'ধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রিজ। হঠাৎ দেখেন একটু দুরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় স্কুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চিৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন.পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চিৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দল্লীর মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধ হয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারা দিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দীর বাপ চিৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনও বোঝেননি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখার কোনও মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

.

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন। সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন, আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

কেন?

লিকার খাব।

পুন্নি তা-ই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকাবে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পং যেতে তার মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

ছোটকাকা।

উ।

ঘুমোচ্ছ?

না।

আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

কেন?

তুমি বললে যে।

ও।

যাচ্ছি।

যাবে? যাও।

চেকটা লিখে রেখেছ?

হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে যাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশি কিছু নয়।

সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক। এত টাকার চেক কি বিনা নোটিশে কাশ করবে?–শানু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে বললেন, করবো ভটচাকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খসখস করে দু লাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ংকর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর

দেখেছেন। ওই নিস্তব্ধতা কত বার তাকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তার কাছেই চলে আসছে। তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনও মাথামুণ্ডু নেই। তার জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনও যোগাযোগ নেই।

পুনির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দু'লাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন, এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন, এখনই কেন?

আমি কালিম্পং যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে-কোনও অজুহাতে শো করবেন!

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন! অনিচ্ছুকভাবে বলেন, আচ্ছা।

দিগিন আর কোনও দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না, এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তার তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুনি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জিপটা রেডি রাখতে হবে, দু-চার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরি কা পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে। সরু মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালি সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর নীল আকাশ।

.

টাকা–এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ওই শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটর-সাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ-দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রিটা উঠে এসে বলল, একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরনো হয়েছে, সেটা পালটানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘকাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রং মোষের গায়ের মতো ভুষকো, তার পিছনে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডান দিকে আরও কয়েকটা রুপোলি চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরনো হয় না।

উত্তরবাংলার কিছুই পুরনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে মানুষের অবিমৃশ্যকারিতায়। ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অত চড়াই-উতরাই ছিল না, ছিল না। অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোট ঘোট কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোট ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু, কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না, তাই রেল কোম্পানি লাইন তুলে দিল। ওই স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙে যেতে হলে বরাবর ওই ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন।

রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুই-ই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনও কালিম্পঙে মোটর গাড়ির রাস্তা হয়নি। কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল, নামটা মনে পড়ছে না, বহুকাল হল উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন চা খেতে নামলেন। তখন যৌবন বয়স। প্লাটফর্মের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট্ট কাঠের স্টেশন ঘর, চারদিকে। খেলনা-খেলনা ভাব, ছোট লাইন, ছোট সিগন্যাল, ছোট নিচু প্লাটফর্ম। তার চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডান দিকে নদীর খাত, দু’ধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোলগাল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা, শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যান্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু’ মুঠিতে কিছু কঁাকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দুরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে, কাজলপরা দুই চোখে শিশু হা করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেননি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে, সেই শিশুটির ধারেকাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে দেখছে, দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইসল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেননি, আদর করেননি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কত বড় হয়েছে। এখন, সংসারীও হয়নি কি! কিন্তু সে-সব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ওই কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, দু’হাতে দু’মুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখ লেপটানো কাজল, আর তাব চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়। তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ও রকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে। না কি শিশুটি নাড়া দেয় অক্ষম

পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেননি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জিপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তারই জিপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জিপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামি, মুখে একটি নির্বিকার শয়তানি ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে, আজও শেষ হয়নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ-গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোট মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও। মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথাটথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে, তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাবজির জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোট গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা-সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোেক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড়-হারামজাদা। সরাবজি থেকে সাহেবের নাম করে দু' বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বউ মরল। মল্লিকা তখন দু-আড়াই বছরের, মা-মরা একলা, কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন। মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফঁাক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে, কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ওই মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোট দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতা বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো করে। বদলে বাপ-বেটিতে পেটভরে ভাত খেত দুপুরে, রাতের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে-মাঝে রাঁধতও কপিল, মুরগির ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছছাড়া করত না। গ্রামগঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়ে-হারা বাপ সক্কালবেলায় কারও কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে। ডাকেনি, শব্দ করেনি। দিগিন তখনও ওঠেননি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল টংগি ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জির ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তন শুনে মরার আগে যে নামাবলীটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়াননা। দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন, শানু তাড়াতে বলে, তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়ে-হারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভাল নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানা রকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে-সেখানে পড়ে থাকে। সে-সব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালিরাই এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালি চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের খেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট, কাঠ, রং, সে কিছু কম চুরি করেনি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালবাসা আছে। জিনিস না-বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালি আর ভূটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক এক বার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রিজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বউ ছিল, নাম ছিপকি। দু' গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপকি আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নিচু শ্রেণির মানুষেরাই ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপকি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাচের চুড়ি, রঙিন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের স্খলিত গলার নানান শব্দ আসত। ছিপকির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পরদার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। একসময়ে মিলিটারির ল্যান্সনায়েক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা গায়ে কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজা থাকত কুরি। নেপালিরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ি অঞ্চলে পেটে ঠান্ডা লেগে এক রকমের হিল-ডায়েরিয়া হয়, সহজে সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালিদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপকিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশি রাতের দিকে ছিপকির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিকিকে নিয়ে। সামনের দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত। তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমি রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে দু'বার চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হননি। মহানন্দা পূলের কাছে ওই দোকানটা যেতে-আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপকিকেও দু-চারবার লক্ষ করেছেন, কপিলকে যেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জিপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তরে বাতাসে। অন্তত চার-পাঁচ পেগ নিট হুইস্কি ছিল পেটে। মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপকির বোধ হয় খদ্দের জোটেনি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলি সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান-মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখছে। দু-চার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপকিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধ হয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপকি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পালটে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক-আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম চা হুস হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপকির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জিপ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপকির স্বামীর সে-সব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার, কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে, চা, রুটি, ডিম।

আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগিনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন, মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জিপটা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে, ও সব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপকির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, দর কত?

ছিপকি একটু দিশাহাবা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনও পায়নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালিতে বলল, লোকটা কী বলছে শুনছ?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন, কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপকিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন, পঞ্চাশ টাকা!

বলেই কোটের ভিতর-পকেট থেকে অন্তত সাত-আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গুনে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপকি তার কঁধ খামচে ধরে ঝাকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পরদাটা কেবল তুলে যোবা হয়ে রইল। এক হাতে পরদা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপকির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ঘোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসেছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপকি, কাধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি! সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করেনি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল, এ সব কিন্তু গরমি নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশি করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কপিলের এঁটো, কিংবা কপিলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝটকায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবদ্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহিন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খসখসে ভাব। গলার চামড়ার ভাজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালিতে বললেন, ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল, সঙ্গে থাকে।

স্বামী?

ছিপকি মুখ ভ্যাঙাল।

দেখি তোর হাত।-বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্ট মনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রু কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন, দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভাল। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল, কত জানি না।

দিগিন বললেন, বাইশ-তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল, কী হবে?

তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, সব লেখা আছে। এ লোকটার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরও পঞ্চাশটা টাকা ছিপকির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন, তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি তুই যখন বড় হবি তখন এ সব দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভাল চাস তো কালই পালিয়ে যা!

কোথায় যাব?

কোথায় যাবি!

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন, শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠগোলায় চলে যাস। শনিবার-মঙ্গলবার থাকি। কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। ফিলমে নামবি? আমার দোস্ত আছে।

হিপকির চোখ-মুখ কী রকম যেন উজ্জ্বল হয়েছিল ফিলমের নামে! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধ হয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুইয়ে বয়ে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ে নদী। তারই জল ছুয়ে একবুক রক্ত ঢেলেছে ছিপকি। কুকরিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

৪. লোকটা ধরা পড়ল

লোকটা এক মাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এ রকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত। চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা নিয়ে আসত হাসপাতাল মর্গে। দু-চার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাওড়রা ফের চাটাই বাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁতত। ছিপকির জন্য এখনও একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেননি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রু কোঁচকালেন দিগিন। রূঢ় মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তার ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনও দিগিনের চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিং-এর কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন, জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল, কয়েকটা শালখুটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন, চৌকিদার কে ছিল?

কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাছে পাঠিয়ে দেন। বলেছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র

পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনও কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনওকালে সন্ধের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন, চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরিটা পাস করতেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেন্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেন্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যায় দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারিও যাবে। চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশি লাভ খাবে, প্রথম লরিটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না। আবার তৈরি করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যাবসাটার মধ্যে উইয়ের মত গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুর করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন, কতক্ষণ লাগাবি?

আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেব' খন।

দিগিন চিন্তিতভাবে জিপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সিটে বসা কপিল একটু কেশে বলল, ঢালাইয়ের দিন

মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন, রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন, হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশি নয়। সবাই যেন পাকে-প্রকারে, নানা আকারে-ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে। গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দুর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশি স্ট্রেচ প্যান্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জি। নীল প্যান্ট, আর হালকা হলুদ গেঞ্জিতে ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবি ধরনের চেহারা, কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন এক বার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জিপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয়নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন, কত টাকার মাল গেছে?

তিন-চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোট কাজ ছিল, বেশি মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, শাটারিং-এর কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছ?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে, না, এখনি আবার শাটারিং-এর কাঠ কিনব কেন? যত দূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর পি আছে। বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন, সে তুমি দেখোগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাত দিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তা ছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন, পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো। আমি কথা বলে যাব, তুমি একটা জিপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্ত্রি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল, আজই ঢালাই করে দেব। আপনি যান।

জিপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জিপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। এক বার চেয়ে দেখলেন, শানুর মুখ খুব গম্ভীর, প্রেস্টিজে লেগেছে বোধ হয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জিপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জিপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্যে মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জিপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরাল জিপ। দিগিন চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, কপিল।

আজ্ঞে।

শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল, অনাদিবাবুর গোলায়।

কখন?

ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়ের লরি এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

কততে বেচলি?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল, শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিন-চার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরে কেটে হাজারখানেকের মতো হবে। আমি তিনশো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধস্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কুটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশো টাকার তিনটে নোট, ভাজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন, সেবক রোড ধরে চলো।

বিনা উত্তরে নিউ মার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণীমোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাবার পর থেকেই ও রকম। ওর ভালবাসার, স্নেহের কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনও অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি আসে কখনও, তো ভাল, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

.

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরী। তেল চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাব আহ্লাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভাল। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোট, দীঘল কালো চেহারা, কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে-আমলে দেখেননি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন-টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা

সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পরদার ফঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরীরা বারেন্দ্রশ্রেণি, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন, ভাল দুটো বারেন্দ্রশ্রেণির পাত্র খুঁজবেন তো। চাটুজ্জে। এ সব পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সালের কথা। তখনও ময়নাকে আনেননি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরী এসে বললেন, আমার বাড়ির ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিজ্ঞেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে।

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন প্লেস করা গাড়ির একটা ইন্টার ক্লাস কামরায় চৌধুরীব দুই মেয়ে, বউ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়। তখন অফ সিজিন চলছে। ফঁকা কামরাটায় তারা মাত্র ক'জন। সে যে বয়ঃসন্ধির আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব। নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনও মনে হয় সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্যা ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরীর বউ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরীগিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি-ঘরের খোঁজখবব নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দু'বটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে-না-ছাড়তেই ঢুলুনি পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসি প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছে। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নি আর ছেলে একটা সিটে দু'ধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে, ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

কেন?

ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানি শাড়ি পরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনও ওইভাবে ছিল। খায়নি! তার নাকি খিদে নেই। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ওই কাঠ কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? না কি দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরি প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হালকা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরীগিন্নি ঘুমগলায় এক বার বললেন, জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠান্ডা লাগবে।

না। আমার মাথা ধরেছে।

গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়। দেখিস।

উঃ, তুমি ঘুমোও না।

কিছু তো খেলি না।বলে চৌধুরীগিন্নি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ওই রোগা একরত্তি মেয়েটার অত দেমাক কীসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনও পরিবর্তন নেই। শুধুমাত্র শরতের ঠান্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধ হয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনও দিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু-ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন, আললাগুলো নিভিয়ে দেব? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আললা থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

শুনছেন!–দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল, দিন।

আপনার অসুবিধে হবে না তো?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন! সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধ হয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা! আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরির মতো, রূপসি জিনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের! কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়। সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ওই মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি!

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারেন না।পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে। চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুটখাট একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন! ওই যে একটু খুটখাট শব্দ হল তাইতেই চৌধুরীগিন্নি উঠে বসলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কি না।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কুট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাঠ হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণির শেষ মাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একেবারে প্রথম রাতে না। ঘুমোলে তার ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেন্ডার সিগারেট একটা বের করে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটু ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগনাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল, ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেক দূর পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভুতুড়ে মাঠে ঘাটে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জিন ছিল, পরি ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল, ক'টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন। কি না। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন, একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন, তুমি ঘুমোওনি?

না। ঘুম আসছে না।—যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ, এত ক্ষীণ আব নরম গলা।

আমিও না।—দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাপুনিটা সামলালেন। বললেন, তুমি কিছু খেলে না।

আমার খিদে পায় না।

কেন?

এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দুর থেকে কানে কানে বলা। তবু কী আশ্চর্য তারা শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

বেশি দিন না।

বেড়াতে যাচ্ছ?

হুঁ। মামার বাড়ি।

আমি সাত দিন পরে ফিরব। তোমরা?

এক মাস।

আর কি তেমন কোনও কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত-শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল, দিগিনকে প্রায় গহিন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনও প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবু এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে এক মাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনও হয়নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগনে-

ভাগনিদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল ওরা আর আসেনি। চৌধুরীগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব কমবে, সময় বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটারগেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্রান্সশিপমেন্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্রান্সশিপমেন্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ-গাড়ি থেকে ও-গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশন-মাস্টাররা ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর-এক রকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী কঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশন মাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তার মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পালটে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারি নিতে। হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে-চোখে একটা উদভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে

চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন, চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানাশুনো, জলপাইগুড়ি কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন, রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী তেমনি উদভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন, এত টাকা, কখন কী হয়!

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও পালটেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়িভাবে কলকাতায় থাকে। বেশিরভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি একটা বউয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটা সবসময় তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্পখাটে বাপ-ব্যাটা শোয়। ঝি-চাকর কাউকে রাখেনি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লিভ নেবেন না, ওই অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে-কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরীর এখন টাকা

ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ণ খড়ি-ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে, আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগনেদের হাতে-পায়ে ধরলেন। বোন বললেন, দাদা, আমি কী করব? ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, ক'দিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলেমেয়ে বউ, সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত। কিন্তু ওই বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়লোকির একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে, তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরিব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরিব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল, এমনি লস সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন

স্পাের্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হাবত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত, ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই খেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে! আমি বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম। দিতাম না। সে খেপে গিয়ে বলে বেতি, নেম্মলটা খচ্চড়। দে'লে নে'লে, দেলে নে'লে, ফের দেলে, ফের নে'লে। নে'লে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ওইরকম। মাঝে-মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জিপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ি রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রিজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নীচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনও বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দু'ধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেল লাইন। ছছাট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বে-খেয়ালে গরমজামা আনেননি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়ালখুশিমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরম জামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনও তার কোনও কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায়নি।

.

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন, কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয়নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, কালিম্পং যাবেন তো?

তাই তো যাচ্ছি।

দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠান্ডা লাগবে।

কাজ। কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চার ধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরনো রেল লাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

ডাকলেন, কপিল।

আজ্ঞে।

ঠিকাদারের চৌকিদারি তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কী কপিল?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন, তোকে একটা বাগান বানাতে দেব। শালবাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো।

কপিল হুঁ দিল।

ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল...

মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল।

দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমাত্র একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কী আছে? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পালটে যাচ্ছে। চতুর ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন, পারবি না?

খুব।

কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জিপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেইসঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ি গোরর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয়। গভীর উদ্ভিদজগতের নেশাড়ু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশ আর তিস্তার ও পারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট, জিপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশি দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তা-ই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ওই দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানখেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ি জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পং ব্যতিক্রম। এই জন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পং নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাকে এইখানে দেখে গেছেন। দিগিন। ওই শ্বেতপাথরের কেদারায় গদি পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমাদেবীকে দেখেছেন ওই কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী!

সেই রবীন্দ্রনাথের সেন্টেনারি হয়ে গেল! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা রা মূর্তি ধীর গভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জিপে উঠলেন এসে। ডাকলেন, রমণী।

আজ্ঞে।

শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

সেখানে চল।–বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন, তোরা কিছু খাসনি?

রমণী মাথা চুলকে বলে, আপনারও হয়নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়সের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু'পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ওইরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশি। চাকর, তবু যেন অন্য রকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তলিয়ে দেখেননি দিগিন। গোলমেলে! একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জিপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে, সেইখানে তো?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারি। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসি বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা।

বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশি বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসি সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশ বছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন, কোথায়?

সেই মিসট্রেসের বাড়ি!– রমণী বলে।

কোন মিসট্রেস?

যেখানে শানুবাবু আসেন।

ওঃ–দিগিন বুঝতে পেরে বলেন, মেয়েটা মিসট্রেস বুঝি?

না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন, শানু প্রায়ই আসে?

সপ্তাহে দু-তিনবার।

বিধবা। তা হলে বয়স কত? বেশি?

না। কম।

বাচ্চা-কাচ্চা নেই?

না। বালবিধবা।

এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি?

এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

নিখিল ব্যানার্জি! সে কে?

আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তরবাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটেনি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দু'জন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে দু'জন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। দায়-দায়িত্বের চাপে চাকা বসে

যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত, মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইসলামিক হিস্ট্রির এম এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুবই কম। বসে খেত। বউ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দু'জনের ঝগড়া হল। প্রেম কত দূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পং থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামি মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

শানু এখানে জুটল কী করে?

রমণীমোহন একটা ঢেকুর তুলে বলল, সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তারপরই চেনা জানা।

কে কাকে ভজাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে, শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটাকে একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাড় করাল রমণী! বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

.

জিপের শব্দ শুনে কেউ উকি দিয়েছিল বোধ হয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নিচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনও লম্বাটে টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে-না-যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে পঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন, মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল, নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহুদিনকার পুরনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা। ফুলদানিতে ফুল! কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনও ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাং-দুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাঁকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন, এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পরদার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফরসা হাত পরদাটা সরাল। রঙিন ছাপা শাড়ি পরা, ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন, নামটি কী?

অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দু'ধারে দু'বার ফেরাল। অর্থাৎ না।

তোমার স্বামীর পদবি কী ছিল?–দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

ভট্টাচার্য।–ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

তা হলে ব্যানার্জি বললে কেন? ইচ্ছে করলেই কি পদবি বদলানোনা যায়?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধ হয় বাইশের বেশি কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

ষোলো–তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

এখন কত বয়স?

একুশ।

বিয়ের ক'দিন পর স্বামী মারা যায়?

কাঠ কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা এক বার করুণাভিক্ষু চোখদুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ছ'মাস।

কী হয়েছিল?

মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

ও!–বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, তার কথা তোমার মনে পড়ে?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

মনে পড়ে না?–দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দুখানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ! দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, না।

এত অল্প বয়সে তোমার বিয়ে দিল কে? কেনই বা!

আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর...!

বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কি না তা বুঝতে পারছিল না বোধ হয়।

দিগিন বললেন, আমি তোমার মা-বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাইনি। কিন্তু তব কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেননি। তবু অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন, যাও, কফি করে আনন।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এ সব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেননি।

মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশি হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন, কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেয়ো না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বোলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশি মিশো না, বুঝলে?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাঁকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।

বাইরে অবশ্য এখনও শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

জিপে উঠে দিগিন আর-একটা চুরুট ধরালেন। বললেন, চালা। মেহের সিং-এর দোকানে একটু থমাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিং-এর দোকান থেকে একটা বড় পাইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোট। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জিপ দাড় করিয়ে ভ্রু কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোট পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জিপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

.

কয়েক দিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর-সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামালেন দিগিন। পিছনের সিট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরনো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপাননা। কয়েকদিনে দু’বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরও দু’ বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...’ গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল, এখানে আনলে যে।

দিগিন ভ্রুকুটি করলেন। বললেন, কেন? খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল। বলল, ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন, যাবে ওখানে?

ময়না বলল, তুমি গেলে যাব না কেন?

এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পৌঁছায়নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল, আর যেয়ো না।

কেন?

সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল, যদি না আসো?

দিগিন ভ্রু তুলে বললেন, আসব না কেন?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনও কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

ও বলে দিগিন ভাবলেন। বললেন, যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ওইরকম। অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাঁকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে! কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভুতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেক দিন ঘুমোননি, বিশ্রাম নেননি। অনেক দিন যেন আবার কোনও শক্ত কাজও করেননি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে! প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

তোমার পায়ের শব্দ পাইনি তোবললেন দিগিন।

তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গিতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ি একটা চুম্বন করলেন। কোনও কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধ হয় তা বুঝল। বলল, এমন সুন্দর আর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে

একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না।

.

কয়েক দিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দু’ খানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকিত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই

পায়ের কাছে কোনও দুয়ে দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ, নদী-উৎস। ওকে ঘিরে আঁছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকেনি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘন্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আটা, মাথায় হ্যাট।

আসছি।-বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন, টানতে পারবে তো লাহিড়ি?

পারব।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ঘোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চার ধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

পারবে তো লাহিড়ি?—দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁপ-ধরা গলায় বলে, পারব, পারতেই হবে।

বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসসা, আমি চালাই।

না হে, তোমাকেও তো এ রকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারিদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন, লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এ রকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন, সাদা অন্ধকার। অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনও দিনই আর নিলেন না।